নাট্য সমগ্র

১

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা
সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা
ফণিভূষণ মণ্ডল

পুনশ্চ

মুখবন্ধ

পৃথিবীর অন্য নানা দেশের থিয়েটারের সঙ্গে ভারতীয় থিয়েটারের একটা মৌলিক প্রভেদ তথা স্বাতন্ত্র্য এখনও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অনিবার্য টানাপোড়েনে। নাট্যসংস্কৃতি এমনভাবেই একটা ভাষা ও তার ভৌগোলিক- ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক আবহে তথা পরিমণ্ডলে প্রোথিত যে তার স্বাদ পেতে অন্য অঞ্চলের মানুষদের চোখ-কান-মন তৈরি করে নিতে হয়। শিক্ষার পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতির কিছুটা বোধ আয়ত্ত করে আমরা সোফোক্লেস, শেক্সপিয়র, মোলিয়ের, চেকভ, ইবসেন, ব্রেখ্‌ট্‌-এর মানসজগতে প্রবেশধিকার পেয়েছি। দেশকালের সংস্কৃতির জলহাওয়ায় শ্বাস নিতে না পারলে ভাষার দূরত্ব পার হয়ে নাটকের অভিজ্ঞতায় ডুব দেওয়া যায় না। বিদেশি নাটকের ক্ষেত্রে এই অন্তরায় ঘোচানোর দায় যদি বা আমরা স্বীকার করি, অভিন্ন একক এক কল্প-ভারতীত্বের মিথ্যা মায়ায় আমরা এই দেশের এতগুলো আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষার স্বতন্ত্র নাট্য সংস্কৃতির মহিমাকে অস্বীকার করে এসেছি। প্রমিত বাংলা ভাষায় লিখিত-উচ্চারিত নাটকে শহরের দর্শক যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, বাংলারই কোনো উপভাষিক স্বরক্ষেপে ও সেই স্বরক্ষেপেরই অবধারিত শারীরবিভঙ্গে যে অন্য-সংস্কৃতি তার নিজস্ব ইতিহাস ও বোধ নিয়ে উঠে আসে, তাতে সাড়া দিতে সেই দর্শক তেমনভাবে আগ্রহী হন না। এই অবিচারী অন্ধতায় বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের মাহাত্ম্য বাংলা থিয়েটার ও তার দর্শকসমাজ চিনতেই পারল না।

বাঙালি প্রাবন্ধিক-সমাজেতিহাসবিদ-লেখকদের অবিরাম প্রয়াসে এতদিনে আমাদের তথাকথিত নাগরিক সংস্কৃতির সেই সংস্কার কিছুটা খসে পড়ে প্রমিত ভাষার 'মর্যাদায়' প্রচ্ছন্ন অন্য-ভাষায় কান পাতার মানসিকতা খানিকটা তৈরি হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বন্ধুবর হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্য সমগ্রের এই প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ। হরিমাধবের বাস ও নাট্যচর্চা উত্তর বাংলায়। সেখানকার আঞ্চলিক উপভাষাই তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির আশ্রয়। তাঁর নাট্যকাহিনি হয়তো সর্বদা সেই অর্থে 'মৌলিক' নয়, মহাশ্বেতা দেবী বা অভিজিৎ সেনের মতো লেখকদের রচনা থেকে গৃহীত। কিন্তু ওই ভাষাই তাঁর নাট্যভাষার নিজস্ব টান তৈরি করে দেয়—যে-টানে ধরা পড়ে গ্রাম বাংলার জটিল বাস্তবের অন্তর্লীন সংঘাতের নাটকীয়তা। পুরোনো সংস্কার ভর করে থাকে গ্রামসমাজের উপর, তারই সুযোগ নিয়ে নতুন শোষকশ্রেণি সরকারি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েই সম্পদ কুক্ষিগত করে, বাড়িয়ে চলে। খেসারত দিতে হয় বঞ্চিত তথাকথিত 'অন্ত্যজ'-শ্রেণির মানুষকে। 'জল' নাটকে ট্র্যাজেডির অভিঘাত তৈরি হয়, ধ্রুপদি ট্র্যোজেডির নয়, আধুনিক ট্র্যাজেডির। পরম্পরার মর্যাদা, তার ভার নিয়েই ('মদের

লেশা লয়রে—জলের লেশা। জল দেখলে আমু য্যামন মাতাল হঞে যাই। মোর লৌ য্যামন মাদল বাজায়ছে। তুর মনে আছে বউ?') মঘাই পুরাণ-মহিমায় মহীয়ান হয়ে ওঠে, তার শারীরবিহঙ্গে দৈবী বিশালতার ব্যাপ্তি মূর্ত হয়, তবু বাস্তবের ক্রূর শঠতা, নতুন শাসনের শক্তি তাকে পরাভূত করে, আমরা দেখি মহীরুহের অমোঘ পতন। বাস্তব যেন পুরাণকে জলশায়ী করে, জলেরই এক আখ্যানে।

'বিছন'-এ দেহাতি হিন্দি নিয়ে আরেক পরীক্ষা হরিমাধবের। উপভাষার দূরত্ব-সান্নিধ্যের দ্বন্দ্ব, পরিচয়-অপরিচয়ের দোলা দর্শককে সচেতন, সতর্ক দ্রষ্টা-পর্যবেক্ষকের যে ভূমিকায় ন্যস্ত করে, তাতেই ওই শোষণনাট্যের আরেক চিত্র মূর্ত হয়। শবদেহ/মৃত্যুর উপস্থিতি, গোপনীয়তা রক্ষার ভারে আত্মজীবনরক্ষার ভার প্রতিদৈনিক শোষণ ও নির্যাতনকে অন্য মাত্রা দেয়। প্রতিদৈনিকই পুরাণপ্রতিম হয়ে ওঠে।

আচার, অন্ধবিশ্বাস বাস্তবের মুখে ভেঙে গিয়েও ভাঙে না, আর ভাঙে না বলেই তাকেই ব্যবহার করে শাসক-শোষক শ্রেণি, তাকেই মদত দিয়ে কর্পোরেট-শাসিত আধুনিক রাষ্ট্রও তার লক্ষ্যসিদ্ধি করে, স্বাধীন, আধুনিক জনমত গঠনে বাধা সৃষ্টি করে। শহর থেকে দূরে গ্রামে, পাহাড়-নদী-বনাঞ্চলসমীপ গ্রামাঞ্চলে সেই দেশব্যাপী পঙ্কিলতার প্রবাহ দেখে আমরা যেমন শিউরে উঠি, তার ব্যান্ড বাস্তবতায় তেমনই সজাগও হয়ে উঠি। আর নাটক তার কুশীলবদের অভ্যস্ত আচরণে, তার প্রত্যক্ষ জৈবতায় সেই সত্য যতটা স্পর্শযোগ্য করে তুলতে পারে, তা তো অন্য কিছুতে পারে না। আর বিশেষত তা যখন প্রকট হয় নাট্যকার-নির্দেশক হরিমাধবের অব্যর্থ নাট্যদক্ষতায়।

এপ্রিল, ২০২১

কলকাতা

ভূমিকা

বাংলা নাটকের ইতিহাসে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর থেকেই তিনি নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক থেকে নাট্য সমালোচক সমস্ত কিছুই হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায় তাঁকে এই সম্মান এনে দিয়েছে। অভিনেতা বা পরিচালক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ করতে গেলে মূলতঃ দর্শক ও অভিনেতাদের সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁর কথা আমরা খুঁজে পাবো তাঁর লেখা নাটকগুলির মধ্যে। দীর্ঘ নাট্য জীবনের মধ্যে তিনি বিচিত্র স্বাদের নাটকের জন্ম দিয়েছেন। সমস্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে সমস্ত বিখ্যাত নাট্যকার রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রতিভা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের ভারতবর্ষে নাটক ছিল এবং এই নাটকের নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ ও অভিনয়কলা সম্পর্কে নানা আলোচনাও হয়েছে। সময় যত পরিবর্তিত হয়েছে ততই এর রূপ এবং আঙ্গিকগত পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির স্পর্শে যখন ভারতবর্ষ তথা বাঙলাতে চিন্তা ও চেতনার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হতে লাগলো তখন নাট্যভাবনা, নাট্যকলা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তনের সুর শোনা যেতে লাগলো। চর্যাগীতির মধ্যে আমরা যখন দেখি—'বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই' তখন বাঙালির ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের দীর্ঘ পরিক্রমার দলিলটি স্পষ্ট হয়। তবে ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরাজ, পর্তুগিজ প্রভৃতি বিদেশীরা তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ভারতীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছিল। মূলতঃ ইংরাজদের নাটকের প্রতি ভালোবাসা এবং কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলার প্রয়াসের মধ্যে ও গেরাসিম লেবেডফের 'বেঙ্গলি থিয়েটার' বাঙালির জীবনে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছিল।

দীর্ঘ সময়সীমা অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের নানা সীমানা পার হয়ে আমরা যখন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলির সমান্তরাল ধারার মধ্যে থার্ড থিয়েটার কিংবা পথ নাটকগুলি জনগণের ভালোলাগার মাধ্যম হয়ে উঠতে লাগলো তখন যাত্রাকে দূরে সরিয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে চলচ্চিত্রের প্রতিস্পর্ধী হয়ে এসে দেখা দিল দূরদর্শন তথা কেবল টিভির দুনিয়া। দেখা দিল নেট দুনিয়া—মোবাইল ম্যানিয়া। জগৎ পরিবর্তনশীল—এক সময় বেতারে শ্রুতি নাটকের প্রতি মানুষের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধগুলির ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। ফেসবুক-হোয়াটস্যাপ যুগের আগে থেকেই সিরিয়ালে মুখ দেখাবার জন্য মানুষের আপ্রাণ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

সব কালেই নাটকের দল গড়ে তোলার জন্য শ্রম-নিষ্ঠা এবং অভিনয় দক্ষতার প্রয়োজন হয়। আগে পাড়ায় পাড়ায় নানা অনুষ্ঠানে উৎসবে একটা করে নাটক হওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেই চর্চাটা এখন খুবই কম। যাঁরা নাটকের দল গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে শিল্পের আদর্শগত একটা দিক স্থান পায়। মহিলা নাট্যকর্মীর অভাব শুধু নয়, নাটকের দলকে নিয়মিত অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাও বেশ কঠিন। আমরা মুখে স্বীকার না করলেও নগরের নাট্যদল এবং মফঃস্বলের নাট্যদলের মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায়। যদিও তার পিছনে শুধুমাত্র নাট্যকলা আছে তা ভাবা ভুল হবে। তবে সময় যত অগ্রসর হচ্ছে ততই এই তথাকথিত মফঃস্বলের নাট্যদলগুলি তাদের নাটকচর্চার মধ্যে দিয়ে সমাজ জীবনে এবং বাঙালির মনে স্থান করে নিয়েছে। নিয়মিত নাটকের অভিনয় এবং নিরন্তর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে কলাকুশীলরা প্রাণবন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই নাটকের দলের তৈরি হওয়া কলাকুশলীরা পর্দায় মুখ দেখাতে গিয়ে অনেকেই চিরতরে হারিয়ে গেছেন। সেদিক থেকে প্রান্তিক বাংলার বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যে দলগুলি টিঁকে রয়েছে তাদের মধ্যে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ অন্যতম।

তিনটি নাট্যদলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ত্রিতীর্থের উত্থানের মধ্যে দিয়ে দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের নাট্য আন্দোলনের একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা সফলতা পেয়েছে। প্রান্তিক শহরে বসে নাট্যচর্চা মোটেই সহজ ছিল না। কলাকুশলী থেকে মঞ্চ সবেতেই সমস্যা ছিল। তবে সমবেত সাধনায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল ত্রিতীর্থ নাট্যদল। আর সেই সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় মুদ্রার অপর পৃষ্ঠ হয়েছিলেন ত্রিতীর্থের। নাটকের দল পরিচালনা করা যেমন সহজ ব্যাপার নয়, ঠিক তেমনি সবকিছুর সমন্বয়ে নাটক লেখার কাজটিও তাঁকে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। একথা ঠিকই যে বালুরঘাটের মাটিতে নাটক আছে—সে মন্মথ রায়ের অবদানের কথাই শুধু নয়, আজও এই অঞ্চলের নাট্যচর্চার মধ্যে দিয়ে এই সত্যটুকু টিঁকে আছে।

একসময় হাওড়া শহরে নাটক করার মধ্যে দিয়ে যে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়েছিল তা চূড়ান্ত আকার নিলো অধ্যাপক হিসাবে বালুরঘাটে থাকার মধ্যে দিয়ে। আমরা জানি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক সংক্রান্ত বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে ইংরাজ অভিনেতা, প্রযোজক নাট্যকার ডেভিড গ্যারিকের কথা উল্লেখ করে থাকি। একথা ঠিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর ভক্তিমূলক নাটক লেখার যে প্লাবন ঘটেছিল হরিমাধবের ক্ষেত্রে তেমন কিছু না ঘটলেও প্রচুর নাটক তিনি লিখেছেন, বিশেষত বালুরঘাটের পুনঃস্পর্শ তাঁকে নতুন নাটক লেখার প্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর পিতা ভালো কীর্তনশিল্পী হিসাবে খ্যাত ছিলেন, তাই নাটকীয় নানা উপাদানগুলি শিশুকাল থেকেই তিনি বালুরঘাটে বসে রপ্ত করেছিলেন। 'দেবীগর্জন'-এর মতো নাটকের অভিনয় করে যখন প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং নির্দেশক হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তখন নিজেদের লেখা নাটকের অভিনয় করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। তিনি নিজের অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নাটকের মধ্যে কীভাবে প্রতিফলিত করা যায় তার প্রয়াস করতে শুরু করলেন। নিজেই এগিয়ে এলেন নাটক লিখতে। তবে অনেক গল্প উপন্যাস কিংবা কাহিনির মধ্যে নাটক হয়ে ওঠার উপাদান থাকে জহুরীর চোখে তা ধরা পড়ে। কথাশিল্পীরা যে মঞ্চ-উপযোগী নাটক লিখতে পারবেন তা নাও হতে পারে। রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না, কেননা মঞ্চসফল নাটক লেখার ক্ষেত্রে তার সাফল্য আকাশ-ছোঁয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক এবং তার মনোরঞ্জনের পাশাপাশি নাটকের পরিবর্তন প্রচুর ঘটেছে। নাটক লেখার পর তা অভিনয়ের উপযোগী করে তুলতে অনেক পরিবর্তন ঘটানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে চরিত্রাভিনেতার উচ্চারণ প্রবণতা, কর্মদক্ষতা সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষমতা বা দর্শকের কল্পনার সামর্থ্যের দিকেও নজর রাখা হয়। 'পার্বতী সুত লম্বোদর'কে পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো' বা 'পাতি লেবু দেবো'কে 'পা তুলে দেবো' হিসাবে যদি দর্শক শুনতে

পায় তখন চরিত্রাভিনেতার উচ্চারণ যে স্পষ্ট নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাট্য নির্দেশককে তাই এই সব বিষয়েও খেয়াল রাখতে হয়। নাটক লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ যেমন নজর রাখতেন কাকে দিয়ে চরিত্রটি অভিনয় করাবেন, তার দক্ষতা এবং সামর্থ অনুসারে নাটক লেখার চেষ্টা করতেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মফঃস্বলে নাটক অভিনয় করার জন্য লিখতে বসে নাটককার হয়তো সেই বিষয়টির প্রতিও নজর দিতেন। কি নারী কি পুরুষ, কাকে দিয়ে অভিনয় করাবেন সেটি গুরুতর প্রশ্ন।

দিনাজপুর জেলা দীর্ঘদিন ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে তার ঐতিহাসিক নির্দশন ও পুরাকীর্তির জন্য। আধুনিক সময়ে তেভাগা আন্দোলন বিশেষতঃ দক্ষিণ দিনাজপুর তথা বালুরঘাট সংলগ্ন খাঁপুরকে সামনে নিয়ে এলো। সেই তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন দিনাজপুরের মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন তুলেছিল। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রথম একাঙ্ক বেতার নাটক লিখলেন 'পঁচিশ পঁচাত্তর'। তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা নাটকটিতে গ্রামের জোতদার জমিদারদের সঙ্গে কৃষকের সংঘাতের চিত্র উজ্জ্বল হয়েছে। তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' আজও পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট করে চলেছে। বেতার নাটক তথা শ্রুতিনাটক হিসাবে প্রথম প্রচারিত হয় আকাশবাণী থেকে ১০ এপ্রিল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। নাটকটি লেখার কাজ শুরু হয়েছিল ৪ মার্চ ১৯৭৮ এবং শেষ হয় ৫ মার্চ তারিখে।

নাটকের কেন্দ্রে জোতদার চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী এবং শ্রেণি চরিত্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি। বরং বলা ভালো স্বাধীন ভারতে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। জোতদাররা যুক্তি অপেক্ষা লেঠেল বাহিনীর ওপর বেশি ভরসা করতো। নাটকে কৃষকরা বুধার নেতৃত্বে সমবেত হয় এবং তাদের দাবি মতো অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। জোতদার নিজেই শঙ্কিত হয় কারণ পূর্বপুরুষের সময় থেকেই আধা-আধি ভাগ নিয়ে এসেছে। সংগঠিত কৃষকরা পঁচাত্তর আর জোতদার পঁচিশ এটা মেনে নেওয়া বেশ কঠিন হয়। তাই জোতদার বুধা, সুদনাদের বোঝাতে থাকে চাষির বিপদে কতবার কত রকমভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, সাহায্য করেছে—সেই সব কথা ভুলে গেল! জোতদারের কথায় চাষিদের মতের কোনো পরিবর্তন হয় না। চাষের জন্য হাল-বলদ, বীজ, সার, মজুরী সবকিছুই চাষিকে দিতে হয়। কিন্তু ফসল ওঠার পর জোতদার অর্ধেক ভাগ নিতে আসে—এটা আর চলবে না। কৃষকরা সমবেতভাবে জানিয়ে দেয় জোতদার পঁচিশ-কৃষক পঁচাত্তর। এই নতুন হিসাব মানার জন্য চাষিরা এক জোট হয়ে একরোখা হয়। শেষ পর্যন্ত জোতদার বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

তেভাগা আন্দোলনে তিনভাগের দুভাগ কৃষকের এবং একভাগ মালিকের বরাদ্দ হয়েছিল অর্থাৎ তেত্রিশ শতাংশ। কিন্তু আলোচ্য নাটকে তা আরও কমে চার ভাগের একভাগ বা পঁচিশ শতাংশে নেমে আসে। কৃষকের পক্ষ নিয়ে লেখা এই নাটকের প্রেক্ষাপট হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা এসেছে এবং শ্রমিক কৃষকের সরকার হিসাবে তা প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছে। দেশের সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়ায় একদিকে নকশাল আন্দোলন এবং কৃষকের অধিনায়কত্বের নানা প্রসঙ্গ তখন সমাজে ও সাহিত্যে আসতে শুরু করেছে। তার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। খেতে না পাওয়া কৃষক দুটি অন্নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। এমনই একটি প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬-৪৭-এর ভাবনার সঙ্গে সমকালীন মানুষের ভূমি কেন্দ্রিক লড়াইয়ের চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। নির্দেশক ও নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর সুগভীর চিন্তার ফসলকে এবার প্রতিফলিত করতে সক্ষম হলেন। নাটকটি বেতার নাটক হিসাবে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তবে তিনি নিজে জানিয়েছেন—"কিন্তু আমি তখন নাটক লেখার কাজে একেবারেই অনভিজ্ঞ। দু-একটা একাঙ্ক নাটক লিখেছি মাত্র। আর বন্ধু শুভ্রাংশুর 'বন্দী সম্রাট' ও নির্মলেন্দুর 'শিশুপাল' নাটক দুটির মাজাঘষা ও সংযোজন করেছি, কিন্তু এককভাবে কোনও পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখিনি। তাই 'জল'-র মতো একটা অসাধারণ গল্পের নাট্যরূপ দেওয়ার দুঃসাহস আমার তখন নেই।"

বন্ধুদের 'বারোটার ঠেক'-এ শৈলেশ রায়ের চ্যালেঞ্জে মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' গল্পের নাট্যরূপ দেওয়ার কাজে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। মহাশ্বেতা দেবীর স্বামী বিখ্যাত বিজন ভট্টাচার্য এবং তাঁর পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় থাকলেও মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে ছিল না। বন্ধু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে দেখা করে শুধু সম্মতি নয়, নাটকের স্ক্রিপ্ট করে দেওয়ার কথা বলেন মহাশ্বেতা দেবী। কিছুদিন বাদে তা পাঠিয়েও দেন, কিন্তু দেখা যায় বড় জোর এক ঘন্টা পনেরো মিনিটের পাণ্ডুলিপি ; পূর্ণাঙ্গ নাটক করা সম্ভব নয়। তখন তিনি মহাশ্বেতা দেবীকে একটি চিঠিতে জানাল—"এই গল্পের যা পেনোরমিক পটভূমি এবং মঘাই ও অন্ত্যজদের জীবনযাত্রা, মঘাই-এর মিথিক্যাল পাওয়ার টু ডিভাইন ওয়াটার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অকারণ অনৈতিক নিষ্ঠুরতা, সমস্ত অন্ত্যজ মানুষের বাঁধ তৈরির চেষ্টা ও মঘাই-এর অমানুষিক আত্মবলিদান, পুলিশের অত্যাচার—এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আপনার নাট্যরূপে ধরা পড়েনি। অথচ আমার বোধবুদ্ধিতে এইসব বিষয়গুলো নাটকে যথাযথ প্রতিফলিত হওয়া দরকার।" এই চিঠির প্রত্যুত্তরে মহাশ্বেতা দেবী পোস্টকার্ড মারফৎ জানান—"আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার গল্প বোঝ। তাই দ্বিধা না রেখে থ্রো অ্যাওয়ে মাই স্ক্রিপ্ট ইনটু দ্য ডাস্টবিন, রাইট ইওর ওন স্ক্রিপ্ট ইওরসেলফ অ্যাজ ইট আন্ডারস্টুড অ্যান্ড ডু ইট। আই গিভ ইউ ফুল লিবার্টি।"

তেরো জুন ১৯৭৮ থেকে শুরু করে দোসরা মার্চ ১৯৭৯ সালে 'জল' নাটকটি লেখা সমাপ্ত করলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। মহাশ্বেতাকে শুধু হজম করা নয়, মঞ্চে তার সঠিক প্রয়োগের লক্ষ্যে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে। বাম থেকে অতিবাম মতাদর্শের প্রতি মহাশ্বেতার দুর্বলতার কথা সকলেরই জানা। একই সঙ্গে আদিবাসী জনজীবনের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের মনের হদিশ সংগ্রহের কাজটি করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। মিথ ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের হৃদস্পন্দন। বাঁধ ভাঙার জলস্রোতে পৃথিবীর সন্তান অভিজিৎ-এর বিলীন হওয়ার কাহিনির মতোই তিনি 'জল' গল্পটিতে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মঘাই ডোমকে ব্যবহার করলেন। যদিও রবীন্দ্রভাবনা থেকে কয়েক যোজন দূরে দাঁড়িয়ে শোষিত নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষের, অস্পৃশ্য মানুষের জলের স্বপ্ন দেখা আর হরিজন মঘাই ডোমের পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতায় মাটির নীচের জলের ধারার খোঁজ পাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ যেন গল্পে অন্যমাত্রা নিয়ে আসে। পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে চরসা নদীর তীরে চরসা গ্রাম। যেখানে মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দু, আর সবই হরিজন। পুরুলিয়ার প্রচণ্ড খরায় নদী মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়। হরিজনদেরও বুক শুকায়। সরকারী ত্রাণ আসলেও তা আত্মসাৎ করে গ্রামের মাতব্বর সন্তোষ পূজারী। মঘাই ডোমের আবিষ্কার করা জলের উৎসে সরকারী টাকায় কুঁয়ো খোঁড়ে সন্তোষ। সকলেই যখন জলের স্বপ্নে বিভোর তখন তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে ১৯৪২-এর আন্দোলনে জেল খাটা প্রৌঢ় শিক্ষক জিতেন মাইতি চলে আসেন চরসা গ্রামে। মানুষের অধিকারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল। বর্ণহিন্দু, সন্তোষ ও এস.ডি.ও-র হুমকি উপেক্ষা করে তিনি হরিজনদের সংঘবদ্ধ করেন। চরসার বুকে তাদের সাহায্যে বাঁধ বাঁধেন যাতে চরসার বুকে জমা বর্ষার জল ব্যবহার করা যায় খরার সময়। এস.ডি.ও খুঁজে পান সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ। পুলিশ, এস.ডি.ও আর সন্তোষের দল ভেঙে দিল বাঁধ আর পুলিশের গুলিতে আহত মঘাই ডোম ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁধ ভাঙা জলে। শোষণ আর জাতিগত অহংকারের স্রোতেই যেন ভেসে গেল মঘাই। গল্পটিকে নাটকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মঞ্চে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হরিমাধবের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। কারণ একদিকে যেমন তিনি মহাশ্বেতার নাট্যরূপটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তেমনি পুরুলিয়া অঞ্চলের কথ্যভাষায় হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজীবনকে মঞ্চে প্রকাশ করাটা সহজ ব্যাপার ছিল না। পঞ্চান্নজন শিল্পীকে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলেন যাতে 'দেবীগর্জন'-র গণ-আন্দোলনের ফটোকপি না হয়ে যায় নাটকটি। কেননা কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁদের সফল প্রযোজনা ছিল 'দেবীগর্জন'।

সূচিপত্র

পঁচিশ পঁচাত্তর	৩১
জল	৪১
ক্ষীরের পুতুল	৯৫
দেবাংশী	১৪৫
বিছন	১৯৫
হাজার স্বপন	২৩৯
স্বখাত সলিল	২৫৭
গোধূলি বেলায়	২৯৫
মন্ত্রশক্তি	৩১৫
অনিকেত	৩৭১
অঙ্গনাগাথা	৪১৩
সন্ন্যস্ত	৪২৯
ঠাকুরদা	৪৭১
নাট্য পরিচিতি	৪৯৭

পঁচিশ পঁচাত্তর

(একাঙ্ক বেতার নাটক)

ভূমিকা

তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাটকটি লেখা। গ্রামের জোতদার পুরোনো নিয়মে চাষিদের কাছ থেকে আধা-আধি ফসলের ভাগ নিতে চায়। কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চাষিরা জোতদারের অন্যায় দাবি মানতে নারাজ। তারা সবাই বুধার নেতৃত্বে একত্রিত হয়, সবাই মিলে বসে ঠিক করে যে, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা জমিদারি জুলুম আর চলবে না। তারা নতুন হিসাবের খসড়া তৈরি করে—জমির মালিক পাবে পঁচিশ ভাগ আর চাষিরা পাবে পঁচাত্তর ভাগ।

গ্রামের জোতদার চাষিদের মুখে এই ভাগাভাগির হিসেব শুনে আকাশ থেকে পড়ে। পুরোনো হিসেব বহাল রাখতে জোতদার শুরু করে অতীতে সে কিভাবে নানা চাষিদের বিপদের দিনে সাহায্য করেছিল। কিন্তু চাষিরা একজোট হয়ে সে কথায় টলে না। কেননা তারা জানে জোতদার শুধু ফসল ওঠার সময় এলে আধা-আধি ভাগ নিতে হাজির হয়। অথচ চাষের জন্য হাল, বলদ, বীজ, সার, মজুরি—কোনো কিছুর দাম তারা জোতদারের কাছ থেকে পায় না। তাই এখন থেকে তারা আর আধা-আাধি হিসাব মানবে না। চাষিদের এই পঁচিশ পঁচাত্তরের একরোখা দাবি অবশেষে জোতদার মানতে বাধ্য হয়।

ইতি
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

৭ মার্চ, ১৯৭৮
ভজনালয়, বালুরঘাট

রচনা আরম্ভ	৪ মার্চ, ১৯৭৮। সকাল ১০টা ২০ মিনিট। ভজনালয়।
রচনা সমাপ্তি	৫ মার্চ, ১৯৭৮। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। ত্রিতীর্থ নাট্যদলে।
পাণ্ডুলিপি	ফুল স্কেল সাদা পৃষ্ঠার একদিকে কালো কালিতে লেখা। পাণ্ডুলিপির মোট পৃষ্ঠা ৮টি।
পত্রিকা	পত্রিকা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।
উৎসর্গ	তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের উদ্দেশে।
বেতার প্রচার	১০ এপ্রিল, ১৯৭৮। আকাশবণী ভবন, কলকাতা।
বি.দ্র.	মঞ্চাভিনয় হয়নি।

আকাশবাণী প্রচারিত

নাটক	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
নির্দেশনা	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
অভিনয়ে	ত্রিতীর্থের অভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ
রেকর্ডিং	৭ এপ্রিল, ১৯৭৮। রাত ১১টা।
প্রচার	১০ এপ্রিল, ১৯৭৮। সন্ধ্যা ৭ টা।

আকাশবাণী ভবন, কলকাতা। ১০ এপ্রিল, ১৯৭৮ প্রথম প্রচরিত অভিনয়ের

চরিত্রলিপি

গাড়োয়ান	জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়
জোতদার	শান্তিরঞ্জন গুহ
বুধা	সত্যরঞ্জন তালুকদার
সূদনা	প্রভাস সমাজদার
অন্যান্য ভূমিকা	সাধন মজুমদার, রাণা রায়, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

আবহে গোরুর গাড়ির শব্দ

জোতদার — অ্যানা তাড়াতাড়ি চল বাপ। তু কি মোক্ মারবু নাকি? আঁধার হয়া আসছে। কিষানগুলানেক ধরা হবে। তার পিছত ভাগবাঁটোয়ারা—এলা কত কাম পড়ে আছে। দেখো দিকি কখন কী হবে? খ্যাঁদা, খ্যাঁদা—এ্যানা পাছত মার সাটে বাড়ি।

গাড়োয়ান — হট্—হরু-রু-রু—হট্।

জোতদার — হ্যাঁরে সিদিন যে আইছুলু গাঁওত কিছু বুঝবা পারলু ভাব-সাব?

গাড়োয়ান — ধান তো সব পালা করিছে নিজের নিজের বাড়িত।

জোতদার — তাত মোর কোনো খেতি নাই। ভাগ দিবে কী হিসাবে কিছু শুনলু? আধা-আধি করবে তো?

গাড়োয়ান — ভাব-সাব তো কিছু বুঝা যায় না।

জোতদার — আরে আহাম্মুক—আনজাদ্ কিছু করবা পারলু?

গাড়োয়ান — মনে তো হয় আধা-আধি হোবে না।

জোতদার — কস্ কীরে! তুই কী মোক্ মারবু নাকি? তোক্ যে দফায় দফায় গাঁওত পাঠাছি এতগুলান ট্যাকা দিয়ে—তো তুই কি করলু? তুই বেবাক মারে দিলু নাকি রে?

গাড়োয়ান — ট্যাকা সব বুঝ করি দিছি কিষাণগুলানেক—শুধাই দেখেন কেনে উয়াদের।

জোতদার — না না, তোক্ কি মুই অবিশ্বাস করি? তুই হছিস্ মোর ছায়া। কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধাছে ওই কিষানগুলান। সবগুলান এক হছে। শোনছি বাড়ি বাড়ি মিটিন্ করোছে।

গাড়োয়ান — ওই বুধাই হছে নেতা। ওই তো কিষাণগুলানেক বুদ্ধি দ্যাছে দশ আনা ছয়আনা ভাগের।

জোতদার — কার নাম কলু—বুধা! সুদনার ছাওয়াল বুধা? সে তো কথাই কবা পারে না—ওর প্যাটত্ এত বুদ্ধি!

গাড়োয়ান — হয়—হয়—অর জবর বুদ্ধি। বাপ্‌রে চোট!—আমাক্ সেদিন মারবা লাগিছিল। শালা এক্কিবারে জাত সাপের বাচ্চা।

জোতদার — ঠিক আছে। আগে গাঁওত যাবা দি, জাত সাপোক্ টিট করার ওষুধ মোর জানা আছে। খ্যাঁদা, খ্যাঁদা—জোরে খ্যাঁদা—

গাড়োয়ান — হট্—হরু-রু-রু—হট্।

Gap Sound. একটুপর সোরগোল শোনা যায়

জোতদার — বুধা আছিস নাকি রে? ও বুধা, আরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে—ম্যালা বসিছে নাকি রে? এ কি বেবাক মানুষগুলান জড়ো হছে দেখছি! হাঁ-রে সুকরা তুই এঁটে জুটিছু। অটা কেরে—কোনেত্ খাড়া হয়া আছে? পোয়াতু না? যা সংকট!—ইয়াসিন তুইও এঁটে? তাই ভাবি—মানুষগুলান গেল কোটে? বাড়িত্ নাই—তা মিটিন্ হছে নাকি রে? তা তুদের নেতা কে রে—বুধা?

পোয়াতু — তাত্ আপনের কী দরকার?

জোতদার — বাপ্‌রে—তোর দেখোছি জবর চোটরে পোয়াতু? কী রে বুধা—তুদের মিটিনে মোর থাকা হোবে, না চলে যামো?

বুধা — আসিছেন যখন তখন বসেন।

জোতদার দেখিছিস্—মহব্বত কাক্ কয়। এই হছে নেতার মতো কথা—বুঝিছঁ। আর হবে না ক্যান—অর বাপ্ সুদনা আছল মোর ছায়া—যখন যা কছি তাই মানে নিছে। যদি কছি সুদনা কান ধরে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাক—সারা দিনমান তো তাই করিছে।

বুধা বাপের কথা ছাড়ে দ্যান।

জোতদার ক্যান রে ছাড়ে দেমো ক্যান? আহা-হা-কী মানুষ আছল রে তোর বাপ্—সাত চড় মারো কিন্তু আও করবে না একটা।

সুকরা হঁ-হঁ, কাজেই ফাঁকিটা দিয়া যাত সহজেই।

জোতদার কথাটা কে কলুরে? গলাটা কার?

পোয়তু মানুষটাক্ চিনে কী হোবে? কথাটা কি মিথ্যা?

জোতদার হাঁরে—এলা কী কথা রে? মুই তুদের ফাঁকি দ্যাছি?

পোয়াতু হঁ—ফাঁকি দিছেন অ্যাত্দিন। কিন্তু ইবার আর অলা বুদ্ধি চলবে না।

জোতদার হাঁরে—এলা কী ব্যাপার রে? হাঁরে—বুধা তুই থাকতে এই কিষাণগুলান আমাক্ রপমান করবে?

বুধা রপমানের কী আছে? ছ্যাঁচা কথাই তো কছে।

জোতদার ছ্যাঁচা কথা! কি ছ্যাঁচা কথা রে?

বুধা হাল, গোরু, বীজধান—সব ত হামরা দেমো তেবে ধানের ভাগ আধা-আধি ক্যান? এটা ফাঁকি না?

জোতদার অঁ—

সকলে হঁ—অ-অ-অ।

বুধা খেতির কাম, বোয়ান, কাটান—বেবাক কামের মজুরি দিনে আট ট্যাকা। হামরা পাই তিন ট্যাকা, ইটা ফাঁকি না?

জোতদার অঁ—

সকলে হঁ—অ-অ-অ।

বুধা খরার সমে বাড়িত্ দিনমজুর খাটালে প্যাট ভাত চুক্তিত্, এট্টা পয়সা ঠেকান না—ইটা ফাঁকি না?

জোতদার অঁ—

সকলে হঁ—অ-অ-অ।

বুধা খরা, বইন্যা, পশুর উৎপাতে ফসল নষ্ট হলে ক্ষেতিপূরণ করমেন না—ইটা ফাঁকি না?

জোতদার অঁ—

সকলে হঁ—অ-অ-অ।

বুধা তামাম বছর বাড়িত্ বসে হুঁকা টাইনবেন, কিষাণগুলান মোলো কি বাঁইচলো তার খেয়াল নাই, শুধু কাটানের সম সম্বন্ধ—ইটা ফাঁকি না?

জোতদার অঁ—

সকলে হঁ—অ-অ-অ।

সবাই শোরগোল তোলে

জোতদার বুঝা পারিছু, বুঝা পারিছু—তোরা সব হল্লা করি মোর পাছত্ লাগিছু।

বুধা মোরা আপনার পাছত্ লাগি নাই,—ইটা সত্যি তাই কছি।

জোতদার হাঁরে, হাঁরে বুধা সত্যি কথা তুই একাই কবা পারিস্—তাই না? তোরা সব সত্যবাদী যুধিষ্ঠীর—তোদের কথাই বেদবাক্য হবে তাই না? হামাগোর কথা সব মিথ্যা, ফাঁকি?

ক—ক, তোদের এখুন দিন পড়িছে—হামাগোরে শোনাই লাইগবে তোদের কথা।

পোয়াতু — হঁ, হঁ—শোনা লাইগবে তো।

জোতদার — হঁ—হঁ, বাপ্ শোনোছি। হাতত্ ফুল ব্যালপাতা নিয়ে শোনোছি। কয়া যা, ক্যারে বুধা ক—

বুধা — এ্যাতদিন আপনারা কথা কছেন, মোদের বাপ্ ঠাকুরদা শুনিছে। ইবার আমরা কথা কছি আপনারা শুনবেন।

জোতদার — হঁ-রে বুধা, তুই কছিস্ এ্যালা কথা? তোর মুখে এত বোল? তুই যে আমার ছাসুত্—আইজ খাড়া হয়া কথা কছিস এলা কার দয়ায় জানিস্? হায় রে, আইজ তোর বাপ্ বাঁইচে থাইকলে—

বুধা — বাপের কথা বার বার উঠাছেন ক্যান? সে তো আর বাঁচে নাই।

জোতদার — বাপ্ বাঁচে নাই তো ডাক তোর মাক্, ডাক তোর শ্বশুর রঘু বর্মনোক। তারা সব জানে সি দিন আমি তোর জন্য কী করিছি। হাবুদার মা ঘরত্ থিক্যা বারায় আসোদিনি—কও দিনি তোমার ছোলোক্, আমি অর জন্য কী করিছি—? ক্যা বুধার মা কথা কছ না ক্যান? ভুইলে গ্যাছো সেই রাইতের কথা—বিশ বছর আগের সেই রাইতের কথা?

দৃশ্যান্তর

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ

সুদনা — বাবু, বাবু—মোক্ বাঁচান বাবু, মোক্ বাঁচান।

জোতদার — সুদনার গলা মনে হছে।

সুদনা — বাবু মোক্ বাঁচান বাবু। (জোতদারের পায়ে পড়ে যায়)

জোতদার — দ্যাখো দিনি কান্দে মরোছে ভোর রাইতে, এলা কি কুঁয়ারা লাগালু? উঠ্, উঠ্—কি হছে কি?

সুদনা — মোর ছইলটাক্ বাঁচান বাবু। মোর একমাত্র ছইল—

জোতদার — কি হছে কি তোর ছইলের?

সুদনা — ভালো ছইল—সন্দার সম মোর সাথ পান্তা খায়ে শুল। ঘড়িক্ খানেক বাদেত্ থে ভেদ বমি। সুরেন ডাক্তারোক্ ধইরে নে আইছোনু। অঁয় কছে অবস্থা ভালো নয়। বালুরঘাট সদর হাসপাতালেত্ নে যাবা কছে। তিন কোশ পথ ক্যামকা কইরে নে যামো? হাঁটে নিয়া গেলে অঁয় বাঁচবে না, রাস্ততি মরে যাবে। আপনার পাটনাই বলদ দুটো আমাকে দ্যান বাবু। গাড়ি জুতে অক্ নে যাই। মোর ছইলটাক্ বাঁচান বাবু।

জোতদার — আরে উঠ্, উঠ্—গাড়িত নিয়ে গেলে তোর সময় লাইগবে, ত্যাতখন কি—?

সুদনা — এ্যাকবার শ্যায চেষ্টা কইরে দ্যাকমেবাবু।

জোতদার — কিন্তুক বলদ জোড়া মোর বড় সখের রে। ওলা তো মুই কাঁওকে—

সুদনা — আপনার পাঁওত্ ধরিছু বাবু, মোর ছইলটাক্ বাঁচান বাবু।

জোতদার — আচ্ছা যা—, টুপ করে গাড়ি সাজা নিয়া চইলে যা। দেরি করিস্ না।

সুদনা — বাবু আপনি আমার মা বাপ বাবু।

দৃশ্যান্তর শেষ হয়। Gap Sound

জোতদার — হঁ—মা বাপ্। সুদনারে ওলা তুই দেখিস্—এলার বিচার ভগমান কইরবে রে ভগমান কইরবে।

বুধা — শাপ দেছেন নাকি?

জোতদার — নিজের বুঝ তোরা নিজেই বুঝিছিস্। ভগমানের বিচার দয়া ধর্ম—এলা তো তোরা

মানিস্ না, তোদের আবার শাপের ভয় আছে নাকি? ওই যে আচানু বইসে আছে—শুধা, শুধু অঁক শুধা—অঁর বিটির বিয়ার সম পঞ্চাশ ট্যাকা ধার নিছিল, শুধিছে অঁয় সেই ধার? ক্যারে কুকড়া তোর ঘর পুড়ে যাবার সময় যে পঁয়ত্রিশ ট্যাকা ধার নিছিলু শুধিছু সেই ধার? কত কমোরে বুধা—কত কমো? এলা কলে নিজের ঢোল পিটান হয়, তাই কইতে চাই না, তুই কথাটা তুললু তাই কনু।

বুধা — ধারের হিসাব এটে তুলিছেন ক্যান?

জোতদার — ক্যান—তুই মোর ফাঁকির হিসাব শুনালু, হামার কামের হিসাবটা তুই শুনবু না ক্যান?

বুধা — ধার দিছেন, ট্যাকা বুঝ করে নিয়েন।

সকলে — হঁ-হঁ, বুঝ করে নিয়েন।

জোতদার — বাপ্‌রে, জবর ট্যাকার গরম দেখোছি তোদের। আসলের সাথ সুদ ধইরে নিলে সব তো ভেইলটে মরবু রে।

পোয়াতু — এলা কথা কয়েন না। যারা ধার নিছে সব শোধ করি দিবে সুদ সমেত।

সকলে — হঁ-হঁ-হঁ।

জোতদার — ট্যাকা শোধ দিবু সুদ সমেত! তোরা কি সব ক্ষেতির কাম বাদ দিয়ে সিদ্ কাটা ধরলু নাকি রে?

সুকরা — এলা কথা কয়েন না। হামরা চোর না বুঝলেন।

শোরগোল ওঠে

জোতদার — বাপরে জবর চোট্ দেখিছি।

বুধা — এলা কথা ছাড়েন। আসল কথাটা শোনেন।

পোয়াতু — কয়া দে বুধা। আসল কথাটা কয়া দে।

জোতদার — কী আসল কথা রে বুধা?

বুধা — ধানের ভাগ।

জোতদার — ও উটা? উটা তো ঠিকই আছে—আধা আধি, যা এ্যাতদিন হছে।

বুধা — না।

জোতদার — না! মানে কী করা চাছিস্ তুই?

বুধা — ওলা পুরানা হিসাব চলবে না। ইবার সব নতুন হিসাব।

জোতদার — নতুন হিসাব!

বুধা — পঁচিশ পঁচাত্তর—।

জোতদার — ও—সব আগের থাকেই ঠিক করে রাখিছু। জোট বাঁধিছু সব তাই না?

বুধা — হাঁ—বাঁধিছি। ধান সব পালা করে রাখিছি। কাল সকালে মারাই হোবে। আপনি ধান বুঝ করে নিয়ে যাবেন। হামাগরের পঁচাত্তরের ভাগ, আপনার পঁচিশ ভাগ।

জোতদার — আইজ তোর বাপ বাঁচে থাইকলে তুই এই হিসাবটা কইরতে পারতিস্ না বুধা।

বুধা — বাপের কথা ছাড়ান দ্যান বাবু। বাপের যুগ গপ্প কথা হয়া গেইচে আইজ। সেই হিসাবে আইজ আর প্যাট ভরে না। আইজকার প্যাট ভরাতে হলে নতুন হিসাবটা চালু করা দরকার। বাবু—আপনি আপনার হিসাব বুইঝে ন্যান। ওই আপিস, আদালতত্, কারখানাত্ যারা কাম করোছে—অরাও অদের হিস্যাব বুঝে নেছে পাই পয়সা। তো হামরা এই কিষাণগুলান যদি হামাগরো হিসাবটা বুঝ করে নিবা চাই—তাত্ অন্যায়টা কীসের বাবু? ধম্মো, ভগমানের বিচার তাত্ খাটো হোবে না বাবু, খাটো হোবে না।

যবনিকা